আ লা প

মঈন চৌধুরী – আনু মুহাম্মদ

সম্পাদনা

শওকত হোসেন

ফিল্যানথ্রপি: মোটিভ বিশ্লেষণ

[আজ ২২ এপ্রিল ২০০৮। বিষয়ভিত্তিক ত্রৈমাসিক পত্রিকা 'হালখাতার' পক্ষ থেকে জনাব মঈন চৌধুরী ও জনাব আনু মুহাম্মদ-এর মুখোমুখি হয়েছি একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য। দেশের উল্লেখযোগ্য কবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিত্ব মঈন চৌধুরী এবং শ্রেণীহীন সমাজকামী অর্থনীতিবিদ ও রাজনৈতিক কর্মী আনু মুহাম্মদ-এর কাছ থেকে তাদের নিজস্ব চিন্তাধারার আলোকে বুঝবার চেষ্টা করব 'ফিল্যানথ্রপি' বিষয়টি কী।]

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি নিয়ে প্রথমে আমরা মঈন চৌধুরীর কাছ থেকে জানতে চাই, ফিল্যানথ্রপি বিষয়টিকে আপনি কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

মঈন চৌধুরী

'ফিল্যানথ্রপি' নিয়ে কিছু বলতে যাওয়ার আগে আমি অন্য আরেকটি বিষয় নিয়ে বলতে চাই, সেটা হল ভালোবাসার দর্শন নিয়ে। 'ভালোবাসার দর্শন' বা 'ফিলোসফি অব লাভ' মানুষের ভেতরে কীভাবে কাজ করে? মানুষের ভেতরে ভালবাসা যেভাবে কাজ করে তার মূলে রয়েছে প্রথমত Eros বা কাম-কামনা, দ্বিতীয়ত Philia বা বন্ধুপ্রেম বা সামাজিক প্রেম এবং তৃতীয়ত Agape বা ঈশ্বরপ্রেম; অর্থাৎ মানুষ যখন তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে জানে না তখন প্রচলিত ধর্মচিন্তার বাইরেও সে এক ধরনের ঈশ্বর-প্রেমে আক্রান্ত থাকে। এটা অবশ্য প্রচলিত ধর্মগুলো আসার আগেও মানুষের মধ্যে নানাভাবে কাজ করত। এখন কথা হল মানুষের মধ্যে ইরোটিক যে বিষয়টি আছে অর্থাৎ কাম বা কামনা, তার একটি বড় ধরনের ফ্যাক্টর হচ্ছে জেনেটিক। যার মধ্য দিয়ে আমরা পুত্র-কন্যার জন্ম দেই এবং বংশরক্ষা করি। এই ইরোজের মধ্য দিয়ে নারী-পুরুষ পারস্পরিক টান অনুভব করে এবং এভাবে তাদের মধ্যকার সম্পর্ক টিকে থাকে। তবে এ বিষয়ে ভিন্ন মতও রয়েছে। যেমন প্লেটো বলেছেন কাম বা কামনা ছাড়াও ভালোবাসা হতে পারে। যেমন প্লেটনিক লাভ। কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার মনে হয় কাম-কামনার বাইরে এ ধরনের ভালোবাসা হওয়া সম্ভব নয়। কাম-কামনা এবং ঈশ্বর -প্রেমের বাইরে যে প্রেম, সেটাই আসলে Philia বা সামাজিক প্রেম, যাকে 'ফিল্যানথ্রপিক' প্রেমও বলা যায়। গণমানুষের জন্যে ব্যক্তিমানুষের ভেতরে কিছু করার জন্য যে আকাঙ্ক্ষা তৈরি হয় সেটা যেমন কাম-কামনা থেকে হয় না তেমনি এর বিনিময়ে সে যে কিছু আবার পাবে সেই চিন্তা থেকেও হয় না। তবে প্রকৃত 'ফিল্যানথ্রপিক' প্রেমকে অনেকে কখনো কখনো ব্যক্তিগত স্বার্থের কাজে ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মানুষের মধ্যে যে মৌলিক সামাজিক প্রেম বা ফিল্যানথ্রপিক প্রেম রয়েছে সেটাকে অস্বীকার করা যাবে না। ইরোটিক যে প্রেম, সেটাকেও মানুষ তো স্বার্থসিদ্ধির কাজে অনেক সময় ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু তাতে বলা যাবে না যে মানুষের মধ্যকার প্রেমের যে প্রকৃত শক্তি, সেটার মোটিভ বা ভ্রূণ বাণিজ্যিক। কামনা, বাসনা ও

বন্ধুত্বের বাইরে থাকে ঈশ্বরপ্রেম। এই ঈশ্বরপ্রেম তখনই সৃষ্টি হয় যখন যুক্তি দিয়ে মানুষ তার ভাগ্য বা ভবিষ্যৎকে আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু ঈশ্বরপ্রেমকে আমরা যাই বলি-না কেন, মানুষের মধ্যে এধরনের প্রেমের অস্তিত্ব বহুকাল ধরেই আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে এটাও সত্য, এই ঈশ্বরপ্রেমের নাম করেও মানুষ নানারকম ফায়দা লুটে থাকে।

ফলে 'ফিল্যানথ্রপি' নিয়ে যতরকম ব্যক্তিস্বার্থ, বাণিজ্য বা ফায়দা লুটে নেয়ার প্রক্রিয়াই চালু থাকুক-না কেন, আমি বলব ফিল্যানথ্রপিক প্রেম বা জনগণের জন্যে যে ভালোবাসা তার প্রকৃতই একটি অস্তিত্ব মানুষের মধ্যে আছে। এবং সেটা নির্দোষ, নির্ভেজাল এবং মৌলিক একটি শক্তি। কথা হল মানুষ যদি সেই শক্তিকে ব্যক্তিস্বার্থে কাজে লাগায় বা সেটা নিয়ে বাণিজ্য করে তাহলে তো মৌলিক ঐ শক্তিকে দায়ী বা অস্বীকার করা যাবে না। কাজেই ফিল্যানথ্রপির বীজ মানুষের মধ্যে জন্মগতভাবেই, এটাই আসল সত্য।

হালখাতা

এবার ফিল্যানথ্রপি নিয়ে আনু মুহাম্মদের কাছ থেকে জানতে চাই, আপনি বিষয়টিকে কীভাবে ব্যাখ্যা করবেন?

আনু মুহাম্মদ

আসলে আমাদের জন্ম এবং বেড়ে-ওঠা এটা একটি সামষ্টিক প্রক্রিয়ার ফসল। অনেক সময় অনেকে ভেবে থাকেন যে আমি একা বা আমি যে কাজ করছি সেটা আমি একাই করছি। কিন্তু এটি ঠিক না। কেননা আমরা অনেক সময় নিজেরাই বুঝতে পারি না যে, এত বড় প্রাকৃতিক আয়োজনের মধ্যে আমরা একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র। তবে প্রাকৃতিক সেই সামষ্টিক প্রক্রিয়ার মধ্যে ব্যক্তির আবার একটি আলাদা অস্তিত্ব থাকে। সভ্যতার প্রারম্ভে যখন সামষ্টিকতা অনিবার্য ছিল কিংবা ব্যক্তির পরিচয় যখন স্পষ্ট হয়নি তখন কিন্তু ফিল্যানথ্রপি বলতে কিছুকে আলাদা করা যেত না। কারণ তখনকার মানুষ যখনই কিছু করত তখন তা সবাই মিলে করত। ব্যর্থতা, সাফল্য, খাদ্য, বাসস্থান– এসব কিছুই ছিল সামষ্টিক ব্যাপার। কিন্তু এ ধারা যখন ভেঙে যেতে থাকে অর্থাৎ যখন থেকে লক্ষ করা গেল কারো কারো সামর্থ্য বেশি আবার কারো কারো সামর্থ্য কম– এরকম এক ব্যক্তি থেকে আরেক ব্যক্তির যখন পার্থক্যটা পরিষ্কার হতে লাগল আমার ধারণা তখন থেকেই এই ফিল্যানথ্রপি ধরনের কাজগুলো শুরু হতে থাকে। কারণ ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য যখন আলাদা হতে শুরু করেছিল তখন থেকেই একজনের জন্য আরেক জনের কল্যাণ বা উপকার করার বিষয়টি চলে আসে। সামষ্টিক বা প্রাকৃতিক সমাজ অর্থাৎ সে সময়কার সেই শ্রেণীহীন সমাজ ভেঙে যাওয়ার কারণেই ফিল্যানথ্রপি নামক বিষয়ের উৎপত্তি ঘটেছে।

হালখাতা

এবার পুনরায় মঈন চৌধুরীর কাছে ফিরে যাচ্ছি। আপনার কাছ থেকে জানতে চাই, মানুষ কী কারণে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে থাকে? এটা কি মানুষের জন্মগত ব্যাপার?

মঈন চৌধুরী

একটু আগে আমরা আলাপ করলাম ফিল্যানথ্রপি আসলে কী, সেটা নিয়ে। এখন দ্বিতীয় পর্যায়ে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো মানুষ কেন করে– এ বিষয়ে বলতে গেলে সবার আগে আমি বলব এটা মানুষের জন্মগত ব্যাপার হলেও হতে পারে কিন্তু বাস্তবে কোনো না কোনো প্রলোভন থেকেই মানুষ ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে। সেই প্রলোভন বা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষিত জিনিসটি বস্তুগত ও অবস্তুগত উভয় রকমই হয়। সুনাম একটি অবস্তুগত ব্যাপার। কিন্তু সুনামকে বস্তুর মতোই আর্থিক মূল্যে বিক্রি করা যায়। কাজেই কেউ যদি সুনামের জন্যে ফিল্যানথ্রপিক কাজ করে তাহলে সেটাকে মোটেও নিঃস্বার্থ কাজ বলা যাবে না। সে অর্থে সকল প্রকার ফিল্যানথ্রপিক কাজই কোনো না কোনো ধরনের প্রাপ্তির জন্যই করা হয়ে থাকে। 'নিঃস্বার্থ দান' এরকম একটি কথা আমাদের সমাজে প্রচলিত থাকলেও আমি মনে করি এ কথার বাস্তব কোনো ভিত্তি নেই। সুতরাং মানুষ ফিল্যানথ্রপি করে প্রধানত দু'টি কারণে। এক. প্রাকৃতিকভাবেই অন্যের উপকার করার প্রবণতা মানুষের মধ্যে রয়েছে, যেটাকে সে ইচ্ছা করলেও দমন করতে পারে না। দুই. ফিল্যানথ্রপি দ্বারা ব্যক্তি তার অন্যায় ও দোষকে ঢাকতে চায় এবং ফিল্যানথ্রপিক কাজ করার মাধ্যমে অর্জিত খ্যাতির বিপরীতে সে শোষণ-নিপীড়ন বা চুরি কলেরও মানুষ যাতে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, সে তৎপরতাই চালায়।

হালখাতা

আনু মুহাম্মদ। আপনি কি আমাদের বলবেন মানুষ ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করে আসলে কোন ধরনের মোটিভ থেকে?

আনু মুহাম্মদ

একটি বিষয় তো আছে যে, অনেক সম্পত্তি হয়তো বাবা-দাদার কাছ থেকে কেউ পেল এবং একটা বিশেষ বোধ থেকে তার এ-ও মনে হতে পারে যে, অনেক মানুষ আর্থিক কারণে কষ্টের মধ্যে জীবন-যাপন করছে। এরকম পরিস্থিতিতে অঢেল সম্পত্তির ঐ মালিক হয়তো জনগণের দুঃখ-কষ্ট লাঘবের ক্ষেত্রে বেশ কিছু সম্পত্তি তাদের ব্যবহার করার সুযোগ দিল। সে হয়তো এটা করে এক ধরনের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে। শুধু এই স্বাচ্ছন্দ্যের কারণেও ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো হতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হল এ ধরনের ফেনোমেনা খুবই রেয়ার। এটি জেনারেল নয়। পক্ষান্তরে আমরা আজ কী দেখছি; বিশ্বব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠান আজ 'সেইভ গার্ড'-এর মতো একটি বিষয় চালু করেছে; এটা হল এমন একটি বিষয় যে, সমাজে যখন মাত্রাতিরিক্ত টেনশন দেখা দিবে তখন এই সেইভ গার্ডের মাধ্যমে মানুষের টেনশনকে রিলিফ করা হয়। যেমন ধরা যাক, সমাজে হয়তো দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি চলছে; তখন সমাজের মানুষ যাতে বিক্ষুব্ধ হয়ে না ওঠে সে জন্যে কোনো পূজা বা ইফ্তার পার্টি বা বড়দিন বা বৌদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে একটি বড় ধরনের খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করা হল। কিংবা হঠাৎ করে হয়তো করের হার বেড়ে গেল; কিংবা দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি যখন সৃষ্টি হল– তখন দেখা গেল আবার একটা ভোজনের ব্যবস্থা করা হল, হয়তো একটা পুরো ভোজনাগারই খোলা হল। সেখানে গরিব মানুষ বেশ খেতে-টেতে হয়ত পারে। এতে করে মানুষ কিছুটা হলেও ভাববে যে, যারা সমাজ বা রাষ্ট্র চালায় তারা জনগণের জন্যে বেশ চিন্তাভাবনা করে। এভাবে ফিল্যানথ্রপির পুরো চেহারাটা আজকে পরিবর্তিত হয়ে এমন

জায়গায় পৌঁছেছে যে মানুষ মানুষের জন্যে শুধু অনুভূতির বশবর্তী হয়ে সহমর্মিতার কারণে কাজ করে যাবে সেটা প্রায় স্রোতের বিপরীত। কাজেই আজকের পৃথিবীকে একটি বিশেষ পদ্ধতি যেভাবে গ্রাস করে ফেলছে তাতে ফিল্যানথ্রপির উদ্দেশ্য বিদ্যমান ব্যবস্থার পরিবর্তনের চাইতে তাকে সমর্থন করাই মূলত। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ বা এনজিও ধরনের আরো যত প্রতিষ্ঠান আছে, এদের এখন একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে– তথাকথিত ফিল্যানথ্রপির অন্তরালে মূলত নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের মাধ্যমে মানুষকে একটি অসহায় জায়গায় আটকে রাখা।

হালখাতা

তাহলে আপনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, আগেকার দিনে কারো সম্পত্তি থাকলে সে যে ফিল্যানথ্রপিক কাজগুলো করত সেখানে অন্তত দুরভিসন্ধি ছিল না। কিন্তু আজকে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ফিল্যানথ্রপির নাম করে নানারকম কূটকৌশলের মাধ্যমে মানুষকে দীর্ঘমেয়াদি পরাধীনতার মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। তাহলে আপনি কি এটা বলতে চাচ্ছেন যে আগেকার দিনের তুলনায় এখন মানুষের ভেতরকার কল্যাণবোধ জটিলতর একটি অবস্থানে পৌঁছেছে?

আনু মুহাম্মদ

সেটা তো বটেই। চারদিকে তাকালে আমরা হয়তো দেখব দালানকোঠা বেড়েছে, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল বেড়েছে, বড় বড় মার্কেট হয়েছে। কিন্তু মানুষের অন্তরের জায়গা আগের তুলনায় সংকুচিত হয়েছে। ধরা যাক্ একটি স্কুল বা কলেজ– এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা যেটা বুঝি, সেটা হল একটি বিশাল খোলা মাঠ থাকবে, বড় পুকুর থাকবে, বড় বড় ভবন থাকবে ইত্যাদি। এবং এরকম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে-কটা স্কুল, কলেজ বাংলাদেশে এখনও আছে, সেগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে জমিদার আমলে। অথচ আজকের যুগের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান মানেই হল আটকা, চারদিক বন্ধ একটি দালান যার সঙ্গে একটি সুপার মার্কেটের কোনো পার্থক্য থাকে না।

হালখাতা

স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, রাস্তাঘাট– এগুলো নির্মাণ করা তো সরকারের দায়িত্ব; তো প্রশ্ন হল সরকারের দায়িত্বের সঙ্গে ফিল্যানথ্রপির কী ধরনের সম্পর্ক বা বিরোধ রয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

আনু মুহাম্মদ

আমি মনে করি একটি বৈষম্য, দরিদ্র-নির্যাতনমূলক সমাজব্যবস্থাতেই ফিল্যানথ্রপির প্রশ্নটি আসে। কেননা একটি রাষ্ট্র চালায় সরকার, সেখানে সরকারই যদি দায়িত্ব নিয়ে মানুষের যাবতীয় অভাব দূর করে দেয়– অর্থাৎ রাষ্ট্র নিজেই যদি স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল, ট্রান্সপোর্ট ইত্যাদি নির্মাণ করে দেয় তাহলে কোনো ব্যক্তির ফিল্যানথ্রপির আর দরকার থাকে না। আসলে আমরা ব্যক্তির কাছ থেকে দান, ফিল্যানথ্রপি বা চ্যারিটি সম্পর্কিত বিষয় তখনই আশা করি যখন রাষ্ট্র মানুষের অভাব পূরণে ব্যর্থ হয়।

হালখাতা

আনু মুহাম্মদ যে কথাটি বললেন এ বিষয়ে মঈন চৌধুরী আপনার মতামত আমরা জানতে চাচ্ছি।

মঈন চৌধুরী

আনু মুহাম্মদের এ কথাটির সাথে আমি পুরোপুরি একমত নই। সরকার ব্যর্থ হলেই ফিল্যানথ্রপির প্রসঙ্গটি আসবে বিষয়টি বোধহয় পুরোপুরি এ রকম নয়। কারণ আমি আমার বাবার নামে একটি হাসপাতাল বানাব, আমার মায়ের নামে একটি কলেজ বানাব– এটা সরকারের যথাযথ উদ্যোগের পরও অর্থাৎ যতগুলো হাসপাতাল বা কলেজ থাকা প্রয়োজন সেই অনুপাতে থাকার পরও একজন ব্যক্তি কিন্তু হাসপাতাল বা কলেজ নির্মাণ করতেই পারে। ব্যক্তির এই রকম কাজের পিছনে অপরের জন্য কল্যাণ করার বিষয়টি যেমন আছে একই সঙ্গে নিজের বাবা বা মায়ের নামে কিছু একটা করা হল– এই আত্মতৃপ্তিও তার থাকতে পারে। কাজেই ব্যক্তিমানুষের চিরন্তন যে বোধ অর্থাৎ সমাজের জন্য কিছু করা, সেটা সবসময় সরকারের ব্যর্থতার কারণ দ্বারা বুঝতে চাওয়া সঙ্গত হবে না। বরং আমাদের বুঝতে হবে একজন ব্যক্তি কোন স্বার্থ বা সহানুভূতি থেকে কাজটি করছে।

হালখাতা

আপনি যে ফিল্যানথ্রপির পজেটিভ দিকের কথা উল্লেখ করলেন, কিন্তু একই দৃষ্টিকোণ থেকে এর নেগেটিভ দিকও তো আছে?

মঈন চৌধুরী

পজেটিভ আর নেগেটিভ দিক সবসময় ছিল। আগেকার দিনে, সামন্তযুগেও, জগন্নাথ কলেজ, সিদ্ধেশ্বরী হাইস্কুল ইত্যাদি সহ অনেক বড় বড় স্কুল, কলেজ তৈরি হয়েছে অথচ এ যুগে ফিল্যানথ্রপি করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় যত্রতত্র মসজিদ-মন্দির বানাচ্ছে। এক ঢাকা শহরেই যতগুলো মসজিদ হয়েছে, এর সংখ্যা তো ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও যথাযথ নয়। অনেক সময় দেখা যায় একটি মসজিদের ডোনার বড় দুর্নীতির সাথে যুক্ত। আবার এত মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও শুক্রবারে দেখা যায়, মসজিদে লোক ধরে না, শেষে মানুষজন রাস্তায় নেমে আসে নামায পড়ার জন্য। কথা হল, এত মসজিদ, এত নামাজি থাকা সত্ত্বেও দুর্নীতি কিন্তু কমছে না। আর এই মসজিদ বানাতে যারা পয়সা দেয় তারা তাদের দুর্নীতির পরিচয়টি আড়াল করার জন্যই মসজিদ-মাদ্রাসা বানিয়ে দিচ্ছে। তবে এ কথা আমাকে অবশ্যই বলতে হবে যে সব ধর্মপ্রাণ মানুষই দুর্নীতিগ্রস্ত নন, প্রকৃত স্রষ্টা-প্রেমই কাজ করে বেশির ভাগ ধর্মপ্রাণের ক্ষেত্রে। কিন্তু দুর্নীতিকে আড়াল করার জন্য করা ফিল্যানথ্রপির মানে বুঝতে কারোর আর বাকি থাকে না। এ যুগেও মানুষ অনেক স্কুল, কলেজ, হাসপাতাল বানাচ্ছে কিন্তু সেটা ব্যবসার জন্য। ব্যবসা আবার দু'ধরনের: একটি হল দেশের মানুষের কাছ থেকে পয়সা নিয়ে শিক্ষা বা চিকিৎসার সুযোগ দেয়া আর অপরটি হল দেশের বাইরে থেকে ডোনেশন আনার মধ্য দিয়ে। এই ডোনেশনের বেশির ভাগ আবার লুটপাট হয়ে যায়। তাহলে দেখা যাচ্ছে সামন্ত-আমলেও যতটা ফিল্যানথ্রপিক কাজ হত এখন সেটা ব্যবসা ও চুরিতে রূপ নিয়েছে।

হালখাতা

এবার আনু মুহাম্মদের কাছে অবার ফিরে আসি। বর্তমানে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এই যে এনজিও, বিভিন্ন রকম ফাউন্ডেশন, ডোনার এজেন্সি, চ্যারিটি প্রতিষ্ঠান তৈরি হচ্ছে; এগুলোকে ফিল্যানথ্রপিক দিক থেকে কীভাবে দেখবেন?

আনু মুহাম্মদ

এ ধরনের অর্গানাইজেশনের কাজকে ঠিক ফিল্যানথ্রপি বলা যায় না। ইদানিং 'করপোরেট স্যোশাল রেসপনসিবিলিটি' বলে একটি কথা চালু হচ্ছে। এই কথার মানে হচ্ছে আমরা শুধু ব্যবসাই করব না; জনগণের সেবাও করব। মুহম্মদ ইউনুস তো এখন আবার 'সামাজিক ব্যবসা' নামে একটি কথা চালু করেছেন। তার এপ্রোচ থেকে অনেকেই ভাববে এটা একটা নতুন কথা, একটা নতুন ব্যবসার কথা বলা হচ্ছে। গ্রামীণ ব্যাংকের মতো একটি প্রতিষ্ঠান বলছে যে আমরা সামাজিক ব্যবসা করছি এবং আরও বলছে এটা তো কোনো 'ব্যক্তি-মালিকানা' প্রতিষ্ঠান নয়। কথা হচ্ছে, 'ব্যক্তি-মালিকানাধীন' কথাটির মানে এখন একটা বেশ ইন্টারেস্টিং জায়গায় এসে পৌঁছেছে। গ্রামীণ ব্যাংক, আশা, ব্রাক– এসব প্রতিষ্ঠান ফরমালি ব্যক্তি-মালিকানাধীন নয় কিন্তু এসব প্রতিষ্ঠানে একজন ব্যক্তিই তো সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছে। সেই পদস্থ ব্যক্তির তো কোনো পরিবর্তন হচ্ছে না। ব্যক্তি সালমান রহমান, এর চেয়ে আর কী বেশি নিয়ন্ত্রণ করে? ব্যক্তি সালমান রহমানের জীবনে মুহম্মদ ইউনুসের চেয়ে আর কী বেশি কর্তৃত্ব থাকতে পারে? ব্যক্তি-মালিকানা ফরমালি না থাকুক কিন্তু এটা তো 'নিউ ফর্ম অব প্রাইভেট ওনারশিপ'। সেখানে এরা চ্যারিটি বা দাতব্য অর্গানাইজেশন হিসেবে রেজিস্টার্ড। কিন্তু এগুলো তো আসলে দাতব্য নয়। এখানে ফান্ড আসছে, ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে, মুনাফা হচ্ছে, বড় বড় এমাউন্টের বেতন নেয়া হচ্ছে, একটা ওয়েল অর্গানাইজড্ ওয়েতে সবকিছু হচ্ছে– তো এটা চ্যারিটি বা ফিল্যানথ্রপি হয় কী করে? অথচ চ্যারিটি, দাতব্য বা ফিল্যানথ্রপিক প্রতিষ্ঠান হিসেবেই এরা রেজিস্টার্ড। আমরা তো জানি এ ধরনের প্রতিষ্ঠান হতে গেলে এক বা একাধিক ব্যক্তিকে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা করতে হয়, অনেক কিছু বিসর্জন দিতে হয়। কিন্তু এখানে তো সেরকম কিছু নেই। এখানে তারা প্রফেশনাল বডি বা কর্পোরেট বডি হয়ে কাজ করছে। এবং সেখানে তার রিটার্নের জন্যে সুনির্দিষ্ট প্রোগ্রাম আছে। তারা গরিব মানুষকে ঋণ দিচ্ছে, বলছে গরিব মানুষের উপকার করছি। এটা যদি এমন হয় কোনো কারখানার মালিক কারখানা দিয়ে বলছে আমি গরিব মানুষের উপকার করছি– এটা তো শুধু বললে হবে না? কারখানার মালিক যেমন নিজের স্বার্থেই কারখানা দেয় একইভাবে এনজিওগুলো নিজেদের মুনাফার স্বার্থেই সুদের উচ্চ হারে ঋণ দিয়ে থাকে। কথা হল এটা তো ব্যবসা করার জন্য সে করছে, এটা তো গরিব মানুষকে উপকার করার জন্য সে করেনি। এখনকার তথাকথিত 'ডোনার' এদেরই গোত্রভুক্ত– আধিপত্য তৈরির প্রক্রিয়ার অংশ।

হালখাতা

কিন্তু যদি এমন হয় যে গরিব মানুষের উপকার করতে গিয়ে ব্যবসাটাও হয়ে যাচ্ছে? আর এই ব্যবসার মুনাফা তো ব্যক্তি নিতে পারছে না?

আনু মুহাম্মদ

(কিছুটা উত্তেজিত হয়ে) মানুষের উপকার করতে গিয়ে মানে কী? এখন একজন জমিদার আগে যে ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করত, সেটা তো সে কোনো রিটার্নের জন্য করত না। কিন্তু এখন কী দেখা যাচ্ছে, এখন দেখা যাচ্ছে কেউ প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় দিচ্ছে, কিন্ডারগার্টেন বানাচ্ছে, কোচিং সেন্টার তৈরি করছে– এগুলোর প্রত্যেকটি হচ্ছে রিটার্নের জন্য। কিন্তু কোনো জমিদার হয়তো স্কুল প্রতিষ্ঠা করত তার মায়ের নামে বা তার বাবার নামে; সেখানেও হয়তো একধরনের রিটার্নের ব্যাপার আছে, সে হয়তো সওয়াবের জন্য এটা করত কিংবা নিজের আত্মতৃপ্তির জন্য করত। এখন জমিদারদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান করার পেছনে যে রিটার্ন আর বর্তমান সময়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করার ক্ষেত্রে যে রিটার্ন– এই দুই রিটার্ন এক জিনিস নয়। আর চ্যারিটি বা দাতব্য হিসেবে যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান রেজিস্টার্ড, সেগুলোর রিটার্ন বা আয়-রোজগার কাগজ-কলমে শুধু দেখানো হয় যে সেটা ব্যক্তি না পেয়ে প্রতিষ্ঠান পাচ্ছে। কিন্তু বাস্তবে একজন ব্যক্তি যখন দিনের পর দিন কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব ধরে রাখে, তখন তাকে ঐ প্রতিষ্ঠানের মালিকই বলা চলে। এবং সেই প্রতিষ্ঠানের আয়-রোজগার বা রিটার্ন কীভাবে ভোগ করা হবে সেটা ঐ একক ব্যক্তির ওপরই নির্ভর করে। আমরা লক্ষ্য করলে দেখব যে এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের মাঠপর্যায়ের কর্মীদের কম বেতন দেয়া হয় এবং তাদের নানা রকম শোষণ-নিপীড়ন করা হয় কিন্তু একটু উপর লেবেলে বা নির্বাহী লেবেলে মোটা অংকের বেতন এবং অতি বিলাসিতাপূর্ণ সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হয়। কাজেই এ ধরনের প্রতিষ্ঠানের রিটার্ন অবশ্যই শেষ পর্যন্ত গুটিকয়েক ব্যক্তিই ভোগ করে।

হালখাতা

মঈন চৌধুরী এ ব্যাপারে আপনি বলবেন কি, এই যে দাতব্য বা চ্যারিটি হিসেবে রেজিস্টার্ড প্রতিষ্ঠানগুলোতে অর্থাৎ আমাদের দেশের এনজিওগুলোতে যে রিটার্ন আসে, কাগজ-কলমে আছে যে, এর ভোক্তা কোনো ব্যক্তি হতে পারবে না। কিন্তু আনু মুহাম্মদ যে বললেন এ ধরনের রিটার্ন এবং কর্তৃত্বের মালিক শেষ পর্যন্ত আসলে গুটিকয় ব্যক্তি-ই, এ ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী?

মঈন চৌধুরী

সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানগুলো অনেক ক্ষেত্রে একটি বোর্ড দ্বারা পরিচালিত হয়। সেই বোর্ডের অধিকাংশ মেম্বারগণই সেখান থেকে কোনো সুবিধা নেন না। শুধু নির্বাহী দায়িত্বে যিনি বা যারা থাকেন তিনি বা তারাই আর্থিক সুবিধা নিয়ে থাকেন। এ ধরনের বহু প্রতিষ্ঠানের নাম আমি করতে পারব। আর আনু মুহাম্মদ যে বললেন, সেখানেও শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিই সব কিছু। এক্ষেত্রে আমি তার সঙ্গে একমত এ অর্থে যে, আসলে যে কোনো ছোট বা বড় উদ্যোগের পেছনে ব্যক্তিরই অবদান মুখ্য। সেই ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে ঘিরে যে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গড়ে ওঠে, সেটা ফাংশন করে বহুসংখ্যক মানুষের কারণে। এমনকি কার্ল মার্কস যে চিন্তা আমাদের দিয়েছেন সে চিন্তাও তো একজন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রথম এসেছে। পরে সেই চিন্তা ফাংশন করেছে বহুজনের কারণে। কাজেই কোনো-না-কোনোভাবে ব্যক্তিই কিন্তু প্রধান হয়ে ওঠে; এই সমস্যা থেকে উত্তরণের চেষ্টা আমরা করতে পারি কিন্তু এর সমাধানের পথ কিন্তু এখনও আমাদের অজানা।

আনু মুহাম্মদ

আমি বলেছি, এই যে ফজলে হাসান আবেদ বা মুহম্মদ ইউনুস– ওনারা তো প্রতিষ্ঠানের শুরু থেকেই প্রতিষ্ঠানের সকল ক্ষমতার মালিক হয়ে আছেন; অর্থাৎ একজন সালমান এফ. রহমান যে মালিক তার সাথে ওনাদের কোনোই পার্থক্য নেই। ফলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হল বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পার্থক্যটা আর রইল কোথায়?

হালখাতা

আনু মুহাম্মদের কাছে জানতে চাই, ক্যাপিটালিজম-এর দুনিয়ায় ফিল্যানথ্রপির মতো বিষয়টি আসলে আমরা কীভাবে দেখব?

আনু মুহাম্মদ

এটি একটি ভালো প্রশ্ন। ক্যাপিটালিজম তো মুনাফা আর লাভ ছাড়া কিছু বোঝে না। যে কারণে সমাজ থেকে এবং মানুষের মন থেকে পারস্পরিক সংহতি, সংবেদনশীলতাও দুর্বল হয়ে যায়। বরং প্রতিটি মানুষের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হচ্ছে, কীভাবে সে ব্যবসা করবে, মুনাফা করবে বা লাভ করবে। মানুষ দেখে যে যেকোনোভাবে টাকা বানালেই ভালো থাকা যায়, ভালো খাওয়া যায় ইত্যাদি। কাজেই অন্যের কী হল সেটা দেখার কিন্তু কোনো সময়ই কারো নেই। সবাই ভাবছে নিজে বাঁচলেই সব হয়ে গেল।

সে রকম একটি বাণিজ্যের, মুনাফার বা শুধু লাভালাভের পৃথিবীতে প্রকৃত ফিল্যানথ্রপির মতো একটি বিষয় নিয়ে কেউ ভাবলে, সেটাই ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায়।

মঈন চৌধুরী

এ বিষয়ে আমি একটু বলতে চাই। সেটা হল, বাণিজ্যের এই যুগে যারা ফিল্যানথ্রপি করছে সেই ফিল্যানথ্রপিক মোটিভ নিয়ে বড় ধরনের প্রশ্ন রয়েছে। যেমন বড় বড় ডোনেশন নিয়ে বা পৃষ্ঠপোষকতা নিয়ে লাইব্রেরি বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান করা যায়। কিন্তু নাটোরের বাগাতিপাড়া উপজেলার মালঞ্চ গ্রামে জন্মগ্রহণকারী পলান সরকার নামের যে মানুষটি বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে বই পড়াচ্ছেন, সেটা কিন্তু ডোনেশন-নির্ভর প্রক্রিয়া থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। পলান সরকার তার ক্ষমতার হয়তো একশ ভাগই ব্যয় করছেন। কিন্তু ডোনেশন নিয়ে যারা কাজ করছেন তারা হয়তো তাদের ক্ষমতার ৬০ বা ৭০ ভাগ ব্যয় করছেন। আমি মনে করি এই পলান সরকার হচ্ছেন প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট।

হালখাতা

কিন্তু প্রশ্ন হল পলান সরকার যতই প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্ট হন, তাকে তো ঠিকই একটি মোবাইল কোম্পানি তাদের বাণিজ্য কিংবা মুনাফার কাজে ব্যবহার করে ফেলল। অর্থাৎ পলান সরকারের অর্জন বাণিজ্যিক মূল্যে বিক্রি করে ফায়দা নিল ঐ মোবাইল কোম্পানি! এখানে দুটি বিষয় লক্ষণীয়, প্রথমত পলান সরকার বা আব্দুল কুদ্দুস বয়াতিদের অর্থের কারণে ব্যবহৃত হয়ে যেতে দেখা যায়। এবং দ্বিতীয়ত, যাদের হাতে ব্যবহৃত হল তারা এতই শক্তিধর যে তাদের হাত থেকে

রেহাই পাওয়া আদৌ কি পলান সরকার বা আব্দুল কুদ্দুস বয়াতিদের পক্ষে সম্ভব? এ ব্যাপারে আনু মুহাম্মদ আপনি যদি কিছু বলেন– ।

আনু মুহাম্মদ

মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানির সর্বগ্রাসী সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন থেকে রেহাই পাওয়া পলান সরকার কেন, এক সেন্সে কারোর পক্ষেই সম্ভব না । তবে আশার কথা এই যে, কোনো শক্তি চাইলেই মানুষ সেরকম হয়ে যাবে এমনটি সবসময় দেখা যায় না । সুনির্দিষ্ট ছকে বেঁধে রাখতে চাইলে কিংবা সুনির্দিষ্ট ডাইসে মানুষকে তৈরি করতে গেলে মানুষ কিন্তু সবসময় সেটা মেনে নেয় না বরং এর উল্টোটাও মানুষকে করতে দেখা যায় । সবাইকে যেখানে টাকা-মুনাফা-লাভের পিছনে দৌড়ানোর জন্য একধরনের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে দেয়া হচ্ছে, সেখানে কোনো কোনো মানুষ কিন্তু টাকাপয়সাকে অনেক তুচ্ছ করেও দেখছে । একটি বড় অর্থকরীকে বা ধন-সম্পদকে বা ক্ষমতাকে তুচ্ছ করে দেখতে বা সেরকম মতাদর্শকে অতিক্রম করতে হলে বড় মন লাগে । আমাদের আশার জায়গা এখানেই যে এ ধরনের লোকও আমাদের সমাজে আছে । সব সমাজেই থাকে । আমি মনে করি পলান সরকার বিজ্ঞাপনের মডেল হওয়ার জন্যে কাজ করেনি । মোবাইল কোম্পানিটি তার বাণিজ্যের স্বার্থেই পলান সরকারকে মিডিয়ায় ব্যবহার করেছে, এতে করে শুধু মোবাইল কোম্পানিই যে উপকৃত হয়েছে তা নয় । তারা পলান সরকারকে ব্যবহার না করলে আমরাও হয়তো পলান সরকার সম্পর্কে জানতে পারতাম না । আমরা জানার পরে কী ঘটছে? আমরা পলান সরকারকে ঠিকই গ্রহণ করলাম কিন্তু তাকে নিয়ে কোনো বাণিজ্যিক তৎপরতাকে আমরা কিন্তু গ্রহণ করলাম না বরং বাণিজ্যিক তৎপরতার সমালোচনায় আমরা লিপ্ত হলাম । এমনকি পলান সরকারের পক্ষ নিয়ে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম তাকে নিয়ে বাণিজ্য করার কুকীর্তির বিরুদ্ধে । আমি বলব এখানেই পলান সরকারদের শক্তি কতখানি সেটা বোঝা যায় । আর এটাই আমাদের আশার বিষয় ।

হালখাতা

প্রকৃত ফিল্যানথ্রপিস্টরা এভাবে মানুষের কল্যাণ করছেন আর রাজনীতিকরা করছেন ভিন্নভাবে । এ দু'ধারাকে পাশাপাশি রেখে আপনি কিভাবে এদের ব্যাখ্যা করবেন?

আনু মুহাম্মদ

হাজী মুহম্মদ মুহসিন, রণদা প্রসাদ সাহা ওনারা বড় ধরনের দাতা । এটা হল একটি দিক । আবার প্রচলিত যে পদ্ধতি আছে, যে পদ্ধতির ভেতর দিয়ে মানুষের উপকার করা হয়, সে পদ্ধতির বাইরে এসে বিষয়টিকে যারা বৈজ্ঞানিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করবে এবং পৃথিবীর মানুষের মুক্তির জন্যে সেভাবে কাজ করবে তাদের তো শুধু ফিল্যানথ্রপি শব্দ দিয়ে বোঝা যাবে না । তাদের কর্মকাণ্ড ফিল্যানথ্রপির চেয়ে অনেক বড় । সে কাজের বিস্তারই প্রয়োজন ।

হালখাতা

ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণা সাধারণত ধনিক শ্রেণীই করছে। তাহলে প্রশ্ন আসা স্বাভাবিক যাদের পয়সা নেই ফিল্যানথ্রপির ক্ষেত্রে তাদের জায়গা কোথায়? গরিব বা যাদের পয়সা নেই তারা কি ফিল্যানথ্রপি করবে না? নাকি ধনীরা সবসময় সেবা-দেবে আর যাদের পয়সা নেই তারা সবসময় সেবা নেবে?

আনু মুহাম্মদ

এটাতো আলাদা কিছু নয়। সামাজিক প্রভাব যেভাবে সৃষ্টি হয়, ইতিহাস যেভাবে তৈরি হয়, যেভাবে মানুষের জ্ঞানস্তর তৈরি হয় কিংবা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে খবরগুলো যেভাবে পুনরুৎপাদিত হয়– এসব বিষয় যেভাবে ঘটে ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষণার সংবাদটিও সেভাবে আমাদের কাছে পৌঁছে। যাদের অর্থ নেই তাদের মধ্যেও অসংখ্য ঘটনা আছে যে নিজের অনেক কিছু বিসর্জন দিয়েও তারা অন্যের উপকার করেছে। কিন্তু সেসব ঘটনা তো ইতিহাস হয়নি, সংবাদ হয়নি বা বইপুস্তকেও আসেনি। অর্থাৎ সেগুলো আমরা কোনোভাবেই জানি না। তবে নিম্নবর্গের ইতিহাস যেমন লেখা হয়েছে, তেমনিভাবে যাদের পয়সা নেই অথচ আপামর জনগণের মুক্তির জন্য কাজ করে থাকে তাদের ইতিহাসও হয়তো একদিন লিখিত হবে। তখন আমরা খুব সহজেই জানতে পারব যে অর্থকরী বা টাকা-পয়সা না থাকলেও ফিল্যানথ্রপি বা লোকহিতৈষী কাজ তাদের অনেকেই করেছে। তখন এটাকে মানুষ শুধু ধনিক শ্রেণীর কাজ হিসেবে বিবেচনা করবে না।

হালখাতা

নারী ফিল্যানথ্রপিস্টদের কথা কিন্তু শোনাই যায় না। অথচ পরোপকার বা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে নারীর অবস্থান কিন্তু কোনো অংশেই কম না। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?

আনু মুহাম্মদ

নারীদের ভেতরে অনেক ফিল্যানথ্রপিস্ট আছে যাদের কথা আমরা জানিই না। এটা এ কারণেই হতে পারে যে নারীদের হাতে তো সম্পদ ছিল না, যে কারণে সম্পদ দিয়ে যেভাবে ফিল্যানথ্রপি করতে হয় সে ধরনের ফিল্যানথ্রপি হয়তো তাদের সেই অর্থে নেই। কিন্তু চোখের আড়ালে দৃষ্টির অন্তরালে অতি গোপনে তারা যে সেবাটা দিয়ে থাকে কিংবা অন্যকে সহযোগিতা করে থাকে সেই ইতিহাস কিন্তু আমাদের সামনে আসে না। কাজেই এসব ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে নারীর যে অংশগ্রহণ সেটাও লিখিত হওয়া প্রয়োজন।

হালখাতা

নারীর ফিল্যানথ্রপিস্টদের সংবাদ যে একেবারেই পাচ্ছি না তা কিন্তু না। যেমন বরিশালের মনোরমা মাসিমা, চট্টগ্রামের রমা চৌধুরীর কথা আমরা জানি।

আনু মুহাম্মদ

সেটা হাতে-গোনা দু'একজনের কথা হয়তো আমরা জানি। মনোরমা মাসিমা– উনি তো জমিদার পরিবারের সদস্য হিসেবে কাজ করার এক ধরনের সুযোগ পেয়েছেন, যদিও রমা চৌধুরীর বিষয়টি আলাদা। আমি বলছি যে এ ধরনের আরো নারী ফিল্যানথ্রপিস্ট রয়েছেন যাদের ইতিহাস লিখিত হওয়া প্রয়োজন। এমন অনেক নারী আছেন যাদের অবদানের কথা শুনলে স্তম্ভিত হতে হয়, যদিও তাদের সে অবদান সবসময় অর্থের সাথে সংশ্লিষ্ট নয়, যা আমাদের জানা থাকা জরুরি।

হালখাতা

মঈন চৌধুরীর কাছে জানতে চাই ফিল্যানথ্রপি দিয়ে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব?

মঈন চৌধুরী

একটা ব্যাপার আমি লক্ষ করেছি, মানুষ কিন্তু যতই নির্যাতিত-শোষিত হয় ততই মানুষ সেটা ভুলে যায়। যেমন এরশাদ সাহেব নয় বছর দুর্নীতি করে যে রাষ্ট্র চালালেন আর এখন আমি অনেককেই বলতে শুনি এরশাদই ভালো ছিল। সেই আইয়ুব খানকে এখনো অনেকে ভালো শাসক হিসেবে মনে করে। আমি বলতে চাচ্ছি, ফিল্যানথ্রপি দিয়ে একটি রাষ্ট্রের মৌলিক পরিবর্তন আনা সম্ভব নয় বরং এরশাদ সাহেবদের মতো শাসকেরা ফিল্যানথ্রপি করেই, নয় বছর টিকে থাকতে পারে, যার অন্তরালে যে কুকীর্তি ছিল সেটা ঐ ফিল্যানথ্রপি দিয়ে ঢেকে রাখা সম্ভব হয়েছে।

হালখাতা

মঈন চৌধুরী যে বললেন মানুষ নির্যাতিত-শোষিত হয়েও নিজেরটা নিজেরা বুঝতে পারে না, এর একটা চলমান প্রমাণ হল, মানুষকে এখনো বলতে শোনা যায়, এরশাদই ভালো ছিল কিংবা আইয়ুব খানই ভালো ছিল; এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী?

আনু মুহাম্মদ

একটি সমাজে ভয়াবহ অবস্থা বিরাজ করে যখন সেই সমাজের মানুষের মধ্যে কোনো ভবিষ্যতের আশা না থাকে। পুরো রাষ্ট্র ও সমাজটাই যখন স্থবির হয়ে পড়ে তখন ঐ রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষের মধ্যে বর্তমান নিয়ে হতাশা দেখা দেয় এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েও যখন কোনো ভরসা পায় না তখন ঐ রাষ্ট্র ও সমাজের মানুষ অতীতমুখী হয়ে পড়ে। তখন সেই সমাজের মানুষকে বলতে শোনা যায় এরশাদই ভালো ছিল কিংবা আইয়ুব খানই ভালো ছিল। ভবিষ্যতের কোনো একটি পজিটিভ কিছু যদি সে দেখতে পেত তাহলে কিন্তু সে অতীতের ঐ সমস্ত লোককে নিয়ে কথা মানুষ বলত না।

হালখাতা

কিন্তু এ ধরনের পরিস্থিতি থেকে মানুষের উত্তরণ ঘটতে পারে কীভাবে?

আনু মুহাম্মদ

এ ধরনের পরিস্থিতি আবার স্থায়ী কোনো ব্যাপার নয়, সেটাই আমাদের ভরসার জায়গা। এ ধরনের পরিস্থিতি মাঝে মাঝে আসে আবার এর উল্টো পরিস্থিতিও আসে। সেটা হল মানুষকে ছক বেঁধে দিলেই সকল মানুষ ঐ ছক অনুসারে তৈরি হয় না। পূর্বনির্ধারিত ঐ ছকের বাইরেও মানুষ আসতে চায়। আমরা যখন দেখি কোনো কোনো মানুষের মধ্যে কোনো-না-কোনোভাবে আর একটি সামষ্টিক বোধ তৈরি হয় তখন আমাদের মনে আশা তৈরি হয় এই কারণে যে ঐ সামষ্টিক বোধ দিয়ে সে বর্তমান কিংবা অতীতকে অতিক্রম করে আরেক ধরনের প্রতিরোধ তৈরি করে এবং পরিবর্তন করার চেষ্টা করে। এভাবে সে তার নিজের জীবনও দিয়ে দেয়। তখন দেখা যায় ঐ দিনের সমাজ এবং তার কিছুদিন আগের সমাজ সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। যেমন সাম্প্রতিক একটি ঘটনার কথা বলি , ধরা যাক ফুলবাড়ির কথা; এমনিতে দেখা যায় সাধারণ মানুষ হয়তো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ করতে ভয় পায় বা প্রশাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে ভয় পায় কিংবা ক্ষমতাবানদের বিরুদ্ধে নমনীয় হয়ে থাকে। কিন্তু ফুলবাড়িতে দেখা গেলো এক ব্রিটিশ কোম্পানি এসে মানুষকে কেনা শুরু করল। একটি সত্য ঘটনা বলি, ফুলবাড়িতে– একজন ভূমিহীন দিনমজুর, তার ছনের ঘর, মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না তারপর আবার মাইনরিটি; কয়লাখনি চাই না এই বলে সে আবার মিছিল করে। এমন অবস্থায় কোম্পানির লোক গিয়ে বলে, তুমি নাকি এই এই সমস্যায় আছ? তখন উনি বললেন, সমস্যায় তো আছিই। কোম্পানির লোক বলল, তোমাকে নিয়ে আমরা তো খুব ভাবি, যদি মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে সাহায্য লাগে..., তখন ঐ লোক তো বুঝে ফেলেছে ঘটনা কোনদিকে যাচ্ছে। কোম্পানির লোক বলল, তোমার জন্য আমরা ষাট হাজার টাকা বরাদ্দ করেছি, তুমি যদি চাও এখনই বিশ হাজার টাকা আমরা দিয়ে যেতে পারি। ঐ লোকের মাথা তখনও ঠাণ্ডা, আমাকে পড়ে বলল, যে তার নিজের উঠানে বসে কথা বলছিল বলে তা না-হলে তাকে তখনই মাইর দেয়ার দরকার ছিল। এরপর কোম্পানির লোক বলে, বিনিময়ে তোমাকে তেমন কিছুই করতে হবে না, তুমি মিছিল-টিছিলে যাবে, তা না-হলে লোকজনে আবার সন্দেহ করবে কিন্তু লোকজনকে ডাকাডাকি করে যে মিছিলে নিয়ে যাও এটা করবে না আর মিটিং-টিটিংয়ে গেলে টুকটাক তথ্য আমাদের একটু জানাবে। সে কোনোভাবেই যখন থামছে না তখন তার বউ ঝাঁটা হাতে করে ঝাঁটা উঁচিয়ে বলছে, গোলামের পুত তুই গোলাম হইছস আমাগোও গোলাম বানাইতে চাস!... তো এরকম ঘটনাও কিন্তু ঘটছে। এভাবে সামষ্টিক স্বার্থ ব্যক্তি-স্বার্থকে অতিক্রম করে যায়, এটা যখন একটি সমাজে ঘটে তখন তার রেজাল্ট অন্যরকম হয়। ফুলবাড়িতে যেকারণে গণমানুষের আন্দোলনকে আর প্রতিরোধ করা গেল না। একইভাবে জাতীয় ক্ষেত্রেও মানুষ যখন ব্যক্তিগত স্বার্থকে এভাবে অতিক্রম করে যায় তখন মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির শক্তিও মানুষ তার নিজের মধ্যে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

হালখাতা

শত ব্যস্ততার মধ্যেও আমাদের সময় দেয়ার জন্য হালখাতা'র পক্ষ থেকে আপনাদের দু'জনকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই ।

উৎস: ' ত্রৈমাসিক হালখাতা' ২য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, এপ্রিল–জুন ২০০৮, [ফিল্যানথ্রপি সংখ্যা] ।
সমন্বয় ও গ্রন্থনা: শওকত হোসেন ও শরমিন নিশাত

.....********.....

সমাপ্ত